[শিরোনাম]

অক্ষয়কুমার দত্তঃ উনিশ শতকের একজন চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক

উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬ সাল)। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী দত্ত। তিনি শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা-সমাজ সংস্কারে। বর্তমান গবেষকের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হল উনিশ শতকের একজন সমাজ চিন্তক ও সংস্কারক হিসেবে অক্ষয় দত্ত তৎকালীন সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন বা তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন এবং এর সামাজিক প্রভাব কতটা ছিল। সাথে বর্তমানে তাঁর কাজগুলির চর্চাও কতটা দরকারি। অক্ষয় দত্তের উপর এযাবৎ প্রকাশিত রচনাগুলি তিন ধরণের—জীবনীমূলক, অ্যাকাডেমিক এবং নিবন্ধকার-স্বাধীন গবেষকদের বিভিন্ন রচনাবলি।

উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে অক্ষয়ের অবদান গবেষণা সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন। তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এরপর শিক্ষাদানের প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক পুস্তক রচনা করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পাঠ্যপ্রণালী (Syllabus) কেমন হওয়া উচিত, কি কি বিষয়ের পাঠ্যদান প্রণালী (Curriculum) হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করেছিলেন। অক্ষয় দত্তের বয়স যখন প্রায় ৯ বছর তখন তিনি গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি (স্কুলে) বর্তমান সময়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী (বর্তমান অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা করেছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করেও তিনি বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেননি। *‘যতদিন জীবন ততদিন শিক্ষা’*—এই সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল *‘শিখব ও শেখাব’*। ১৮৪০ সালের জুন মাসে *‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’* স্থাপিত হলে তিনি সেখানে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। ঐ পাঠশালায় তিনি বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা—এই দুই বিষয়েও শিক্ষাদান করতেন। ১৮৫৫ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য *‘শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুল’* স্থাপিত হয়। তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন।

তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় যখন পড়াতেন তখনও বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্য বই ছিল না। তিনি বাংলা ভাষায় *ভূগোল* বই লিখলেন (১৮৪১)। এরপর তিনি রচনা করেন *চারুপাঠ*, তিনটি খণ্ডে (১৮৫৩, ১৮৫৬ ও ১৮৫৯ সালে)। ১৮৫৬ সালে তিনি লেখেন আরও দুটি পুস্তক—*ধর্ম্মনীতি* এবং *পদার্থবিদ্যা*। তাঁর রচিত ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বই।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, অক্ষয়কুমারের ভাষা "বিদ্যাসাগরের পূর্বে, 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতার' হস্ত হইতে আপনাকে নির্মুক্ত করিয়াছিল।" সত্যিই উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অক্ষয় ও বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে আধুনিক, দৃঢ় সংবদ্ধ ও দার্শনিক আলোচনার যোগ্য বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি অক্ষয় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার শুরু করলেন। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল উপযুক্ত এবং বিভ্রান্তিহীন পরিভাষা, এবং প্রবন্ধের উপযোগী ভাষার কাঠামো ও বিন্যাস, যার মাধ্যমে অনায়াসে গদ্য সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে। এছাড়া, বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার প্রাথমিক দায়িত্ব যথাযথ ও নির্ভুল হওয়া, এর পরে আসে তার সরল ও মনোগ্রাহী উপস্থাপনা।

এই কাজ সুষ্ঠ পদ্ধতিতে করার জন্য চাই যতিচিহ্নের ব্যবহার, যে বিষয়টি সেকালের পয়ার ছন্দে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক এক উপাদান ছিলনা। গদ্য রচনার উপযুক্ত বাংলা ভাষাই শুধু নয়, অক্ষয় দত্ত রচনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলা সাহিত্যে *'যতিচিহ্ন'*-এর প্রবর্তন করেছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে ধার করে। কিন্তু অক্ষয়ের পরিবর্তে বিদ্যাসাগরকেই সকলেই 'যতিচিহ্নের পথিকৃৎ' মনে করেন। অক্ষয় দত্তের ১৮৪১ সালে রচিত 'ভূগোল' গ্রন্থেই আধুনিক যতি চিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

অক্ষয় দত্ত *বিদ্যাদর্শন* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৪২), টাকিবাসী প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহায়তায়। এই পত্রিকাটি মাত্র ৬ মাস প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ১৮৪৩ সালে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। তিনি ১২ বছর (১৮৫৫ পর্যন্ত) এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকা *ব্রাহ্মধর্ম* প্রচারের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়ের হাত ধরে তাতে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বিষয়গুলির প্রবন্ধগুলিও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষার যে ওজস্বী, গম্ভীর রচনা সম্ভব

এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই ইংরেজি ভাষার মতন বাংলা ভাষাতেও আলোচনা করা সম্ভব এই পত্রিকা তা শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরেছিল।

অক্ষয় দত্ত কেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক ছিলেন, পাশাপাশি তাঁর জীবন দর্শন পরিবর্তনের দিক নির্দেশও আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। জীবনের মধ্যভাগে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে *'ব্রহ্মবাদী'* হয়েছিলেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ-বলিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারমূলক কার্যাবলীর পাশাপাশি ব্রাহ্মধর্মকে ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে *নব্য ভদ্রলোক*-দের কাছে গ্রহণযোগ্য করারও চেষ্টা করেছিলেন। এভাবেই তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরে তখন, যখন তিনি একদিকে ব্রাহ্মধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে দেবেন্দ্রনাথের সাথে বিতর্ক করছেন, শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা-পত্রিকা এবং ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরীশ্বরবাদের চর্চা করছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। ব্রহ্মবাদী থেকে প্রথমে তিনি সংশয়বাদী হন এবং সর্বশেষে নিরীশ্বরবাদী। তাঁর জীবনের এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যায়গুলি ঘটনা পরম্পরায় (Chronologically) আলোচনার প্রয়োজন। তাঁর জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দুই খণ্ড) বইটি তাঁর জীবন দর্শন পরিবর্তনের সাক্ষী।

অক্ষয় দত্ত একজন সত্য সন্ধানী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞানতৃষা তাঁকে মুক্ত মানুষ হতে সাহায্য করেছিল। তিনি বলেছেন, *Truth is the goal, reason is the way.* অক্ষয়ের যুক্তিবাদী কথাগুলি বৈজ্ঞানিক ধারার আধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কোন ধর্মীয় শাস্ত্রকে গুরুত্ব দেননি, এর কোন ফাঁক পূরণেরও দায়িত্ব নেননি। যা সত্য, যুক্তি-বিজ্ঞানের পক্ষে ঠিক তাই বলেছেন ও মেনেছেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে 'জীবন দর্শনের' পরিবর্তন ঘটেছিল, তা সহজেই লক্ষণীয়। বর্তমান গবেষক তাঁর জীবনের দার্শনিক পরিবর্তনগুলি নিয়েও আলোচনা করতে আগ্রহী। জীবনের প্রারম্ভে পারিবারিক উদারতা-ধর্মভীরুতার পর্ব পার করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কখনই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না, এমনকি খ্রিষ্টান প্রভাবও তেমন কাজ করেনি। তাঁর জীবন দর্শনে ইউরোপীয় চিন্তার গভীর প্রভাব ছিল।

রামমোহনের আদর্শে ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি *ব্রাহ্মধর্ম* গ্রহণ করেছিলেন (১৮৪৩)। কিন্তু কখনও পৌত্তলিকতা, বেদের অভ্রান্ততা, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি মানেননি। তাঁর কাছে মূল বিষয় ছিল যুক্তিবাদ। ফলে তাঁর সাথে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম উপাসনা ও অন্যান্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব হতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গের এই প্রহরীকে তর্কে-যুক্তিতে পরাজিত করতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। উপরন্তু তাঁরা অক্ষয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন অক্ষয়ের দুর্ভেদ্য যুক্তিগুলি। গবেষক ও নিবন্ধকাররা মনে করেন যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে *"পরমেশ্বর"*-এর উল্লেখ করেছেন তা ছিল তাঁর ইচ্ছার বাইরে ও তাতে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা-প্রভাব ছিল বেশি। নিজের *কর্মচারীর* প্রতি দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার চাপ সৃষ্টি করে এটা করেছিলেন।

এমনকি অক্ষয় দেবেন্দ্রনাথের *ব্রাহ্মধর্ম্ম* (১৮৪৯) গ্রন্থের উপরেও অসন্তুষ্ট ছিলেন; কারণ, ঐ গ্রন্থের প্রচারে বেদ-উপনিষদের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর সমানই থেকে গিয়েছিল। আসলে, দেবেন্দ্রনাথের *ব্রাহ্মধর্ম্ম* বইটি যখন প্রকাশিত হয় সেই একই সময়ে হিন্দু হস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয়ের কাছে ঈশ্বরকে *'প্রার্থনা'* করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি একটি সরল সমীকরণ বলে এই প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন,

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

সুতরাং, প্রার্থনা = ০ (শূন্য);

কৃষকরা পরিশ্রমের দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন। পরিশ্রমের সাথে প্রার্থনা করলেও সেই একই পরিমাণ শস্যই উৎপাদিত হয়। তাই প্রার্থনার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ, তাঁর মতে, প্রার্থনার কোন ফল নেই। প্রার্থনা ও কাজ আসলে বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিষয়। কিন্তু অনুশীলন করলে কাজ হয়-ফল পাওয়া যায়। কারণ এর বাস্তবতা বিদ্যমান। তাছাড়া প্রার্থনার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আধ্মাত্যবাদীদের মতে, প্রার্থনার একটি অলৌকিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রার্থনাকে অকেজো বলে নাকচ করলে প্রার্থনার লক্ষ্য যে দেব-দেবী বা পরমেশ্বর তাকে আর প্রার্থনা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হয়না। এভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হল।

এই সম্ভাষণের গূঢ়ার্থ বুঝতে হলে প্রার্থনা সমীকরণটি ছাত্রদের সাথে আলোচনার সময়কালে দত্ত যে প্রবন্ধগুলি/গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন সেগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বইয়ের কথা আগেই উল্লেখ

করা হয়েছে। দার্শনিক গুরুত্ব সম্পন্ন তাঁর প্রথম বই ছিল *'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'*-এর প্রথম (১৮৫১) ও দ্বিতীয় (১৮৫৩) খন্ড। এটি মৌলিক রচনা নয়, জর্জ কুম্বের (১৭৮৮-১৮৫৮ সাল) লেখা *'Essay on the Constitution of Man and its Relation to External Object'* (১৮২৮) বইটির প্রায় একরকম ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। প্রবন্ধকার আশীষ লাহিড়ী বলেছেন, অক্ষয়ের জীবনের প্রথমদিকে জর্জ কুম্বের প্রভাব ছিল। তাই তিনি *বাহ্যবস্তু* বইটি লিখেছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলে চিনব যখন তিনি বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক করছেন ও প্রশ্ন তুলছেন।

তাঁর রচিত *'চারুপাঠ'*-এর তিনটি খন্ডে তিনি কমোলমতি শিক্ষার্থীদের যাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় ও মানসিক গঠন তৈরি হয় সে সমস্ত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে সমুদ্র যাত্রা (কালাপানি) নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বাধা-নিষেধ ছিল, যা ভুল প্রমাণ করার জন্য *"প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার"* (১৮৪৯) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে *"বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ"* (১৮৫৫) রচনা করেন। এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের দার্শনিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত।

এছাড়া তিনি লিখেছেন—*"ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব"* (১৮৫৫), *"ধর্ম্মনীতি"* (১৮৫৬) ও *"পদার্থবিদ্যা"* (১৮৫৬) বইগুলি। তিনি ধর্ম্মনীতি বলতে Principles of Morals বুঝিয়েছেন। এগুলি কোন ধর্মীয় (Religious) গ্রন্থ না, 'Moral Philosophy' একটি প্রাচীন ধারণা। রেনেশাঁ পূর্বের এই ধারণাই তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার পরাধীন নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তিনি *পদার্থবিদ্যা* বইয়ে ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের (Physics) বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ অনুবাদ করে নিজের ভাষায় ও ঢঙ্গে লিখেছেন।

তিনি 'শিরোরোগ' (শিরোঃপীড়া) [*মাইগ্রেইন* বা Migraine] নিয়ে প্রবল অসুস্থতার মধ্যে লেখেন *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ সালে। যেখানে ১৮২টি হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় কথাটা উল্লেখ না করে উপাসক সম্প্রদায় বলেছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর গবেষণা ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার পরিচয় বহনকারী। রাজনারায়ণ বসু অভিযোগ করেছিলেন অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মবাদের উপর বিশ্বাস থেকে সরে এসে অজ্ঞেয়বাদী হয়ে ওঠেন, যার প্রমাণ ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়-এর অনেকগুলি পাতা। আসলে এই সময় তিনি নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল তিনটি খণ্ডে ভা উ-স প্রকাশিত করার কিন্তু শিরোরোগের জন্য তিনি ৩য় ভাগ লেখার কাজ শুরুই করতে পারেননি! এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি নিজেই নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা বেদনাবিধুর ভাষায় বলেছেন। আজ যখন আমরা তাঁর এই বইটি পড়ব তখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, এর প্রতিটি পংক্তির গায়ে আছে একটি মহান মুক্তমন মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রামের ২৫ বছরের একটানা শারীরিক যন্ত্রণার নিঃশব্দ-লাঞ্ছনা।

দত্তের এই বইটি অন্য একটি কারণেও অনন্য। কারণটি হল বইটির *উপক্রমণিকা* (ভূমিকা)। যা মূল বইয়ের আয়তনের চেয়ে অনেক বড়, এরকম সাধারণত হয় না! 'উপক্রমণিকা' শীর্ষক এই ভূমিকা আবার ভা উ-স প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মিলে দুটি খণ্ডে বিভক্ত। দুটি ভাগ মিলে উপাসক সম্প্রদায়গুলির জন্য লেগেছে ৩৮০টি পৃষ্ঠা, সেখানে 'উপক্রমণিকা'-এর জন্য লেগেছে ৪৩২টি পৃষ্ঠা। বর্তমান গবেষকের কাছে এই উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থটির উপক্রমণিকা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সম্প্রদায়গুলি নয়।

চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২ সাল)-এর *'অরিজিন অফ স্পিশিজ'* (১৮৫৯) বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আশীষ লাহিড়ী লিখেছেন, ১৮৫৯ সালে ডারউইনের এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেরই মত অক্ষয়েরও চিন্তাভাবনা একটা সুনির্দিষ্ট বাঁক নেয়। তিনি অল্পকালের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্বে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন। তিনি সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব-এর সাথে ডারউইনের অভিযোজন তত্ত্বের (The Theory of Evolution) মিল খুঁজে পান। সাংখ্য দর্শনের কয়েকটি বিষয় নিয়ে অনেক "তর্ক-বিতর্ক বিচার ও সিদ্ধান্ত" আছে, তিনি সেই সব বিষয়কে "কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক" বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার কোন ধারার কাছেই অক্ষয়ের কোন ঋণ নেই—না প্রকৃতি দর্শনের ক্ষেত্রে, না জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর চিন্তার প্রধান উৎস পেয়েছিলেন বেকন্ (যাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জনক বলা হয়) এবং কোঁত (ধ্রুববাদের প্রবক্তা)-এর কাছ থেকে। উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই দুজনেই ছিলেন নতুন এক জগতের দিশারী। বাংলায় ধ্রুববাদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল *'নিরীশ্বরবাদ'*। উনিশ শতকের বহু শিক্ষিত বাঙালিই ধ্রুববাদী হয়েছিলেন নিরীশ্বরবাদের টানে। অক্ষয় দত্তও সেই একই ধারার লোক ছিলেন। এবং তাঁর ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে চার্বাক নিরীশ্বরবাদীদেরই সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়।

অক্ষয় দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের একজন বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। রামমোহন, ডিরোজিও-এর পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারে তার ভূমিকা উজ্জ্বল নক্ষত্রের

মতন। তিনি কুসংস্কারে নিমজ্জিত উনিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনে সজোড়ে আঘাত দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু-সহকর্মী (সমদর্শী) বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন তখন তিনি সমর্থক হিসেবে সর্বাগ্রে ছিলেন। এমনকি দত্ত বিদ্যাসাগরকে তাত্ত্বিক সমর্থনও প্রদান করেছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়।

অক্ষয় জাত-পাত, জাতের মধ্যে ভেদাভেদও মানতেন না। যা এই সময়ের অন্যান্য ব্রাহ্মদের থেকে তাঁকে পৃথক করেছিল। তিনি সত্যিই জাতের 'ভেদ মারিয়াছিলেন', 'নীচজাতীয়' ধাঙ্গড়দের ঘৃণা করেননি, নিছক গবেষণার উপাদান বা উপাত্ত বলেও মনে করেননি, মানুষের মর্যাদা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের বাংলায় যেখানে জাতিভেদ-বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল তখন তিনি এরকম অবস্থান নিয়েছিলেন। ফলে তিনি একজন ব্যতিক্রমী সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

সামগ্রিকভাবে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের প্রাচীন দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি ক্রমশ অনুভব করেন যে পৌত্তলিকতা (idolatry) এবং বহুদেববাদ (polytheism) আসলে একটি অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস, যা পশ্চিমের লোকেরা খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের মধ্য দিয়ে বহুকাল আগেই কাটিয়ে উঠতে পারলেও সনাতন হিন্দু ধর্ম তা আজও পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে শুধুমাত্র বলেছিলেন, *'আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল।'* গবেষকরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ এর বেশি আর কিছু না বলায় অক্ষয় দত্ত জনমানসে প্রচার পায়নি। কিন্তু তিনি উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি ইতিহাসে প্রোট্রেট হয়ে রয়েছেন। এই গবেষণা সন্দর্ভে আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষক আশা প্রকাশ করেন যে, অক্ষয় দত্তকে নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছে তার প্রসার ঘটবে। এবং এর ফলে অক্ষয়কে বুঝতে হয়ত আর কেউ ভুল করবেন না। পরিশেষে, আশা করা যায়, তিনি অজ্ঞাত থেকে জ্ঞাত হবেন আমাদের কাছে। এভাবেই হয়ত দুই শতাব্দীর ঋণ শোধ করতে সক্ষম হব আমরা।